প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এই প্রবন্ধটি ‘উদ্বোধন’ পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহাতে শ্রীমৎ স্বামীজীর গভীর মনস্বিতা ও ভূয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। আমাদের সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায় : একদলের মথে পাশ্চাত্যের যাহা কিছু সবই নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর; দেশী জিনিসের মধ্যে আদৌ দেখিবার বা ভাবিবার বিষয় কিছুই নাই। অপর দল ইহার ঠিক বিপরীত মতাবলম্বী, হিন্দুদের এবং হিন্দুসমাজের যে কোন কিছু দোষের থাকিতে পারে, তাহা একেবারেই অসম্ভব বিবেচনা করেন; আর যে পাশ্চাত্য জাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ সমস্ত পৃথিবীময় আপনার রাজত্ব বিস্তার করিতে বসিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে আমাদের যে কিছু শিখিবার আছে, ইহা তাঁহারা কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। এই প্রবল স্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে হিন্দুসমাজ আত্মহারা হইতে বসিয়াছে। স্বামীজীর এই প্রবণধ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোত যথার্থ পথে প্রবাহিত করাইয়া দিবে, এই আশা করিয়া ইহার পুনর্মুদ্রণ করা গেল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

[স্বামীজীর এই মৌলিক রচনাটি প্রথমে ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার ২য় ও ৩য় বর্ষে ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ নামে ধারাবাহিকভাবে এবং পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।]

সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দনবিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্ব কারুজার্যমন্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্মরপ্রাসাদ; পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে ভগ্ন-মৃন্ময়প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদ দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটিরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ ছিন্নবসন যুগ-যুগান্তরের ণিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালকবালিকা; মধ্যে মধ্যে সমধর্মী সমশরীর গো-মহিশ-বলীবর্দ; চারিদিকে আবর্জনারাশি -- এই আমাদের বর্তমান ভারত।

অট্টালিকাবক্ষে জীর্ণ কুটির, দেবালয়ক্রোড়ে আবর্জনাস্তূপ, পট্টশাটাবৃতের পার্শ্বচর কৌপীনধারী, বহ্বন্নতৃপ্তের চতুর্দিকে ক্ষুৎক্ষাম জ্যোতির্হীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি -- আমাদের জন্মভূমি।

বিসূচিকার বিভীষণ আক্রমণ, মহামারীর উৎসাদন, ম্যালেরিয়ার অস্থি-মজ্জা-চর্বণ, অনশন-অর্ধাশন-সহজভাব, মধ্যে মধ্যে মহাকালরূপ দুর্ভিক্ষের মহোৎসব, রোগশোকের কুরুক্ষেত্র, আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কাল-পরিপ্লুত মহাশ্মশান, তন্মধ্যে ধ্যানমগ্ন মোক্ষপরায়ণ যোগী -- ইওরোপী পর্যটক এই দেখে।

ত্রিংশকোটি মানবপ্রায় জীব -- বহুশতাব্দী যাবৎ স্বজাতি বিজাতি স্বধর্মী বিধর্মীর পদভরে নিষ্পীড়িত-ফ্রাণ, দাসসুলভ-পরিশ্রম-সহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন, আশাহীন, অতীতহীন, ভবিষ্যদ্‌বিহীন, ‘যেন তেন প্রকারেণ’ বর্তমান প্রাণধারণমাত্র-প্রত্যাশী, দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচ-চাতুরী-প্রতারণা-সহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্বলের যমস্বরূপ, বলহীন, আশাহীনের সমুচিত কদর্য-বিভীষণ-কুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক-মেরুদন্ডহীন, পূতিগন্ধপূর্ণ-মাংসখন্ডব্যাপী কীটকুলের ন্যায় ভারতশরীরে পরিব্যাপ্ত -- ইংরেজ রাজপুরুষের চক্ষে আমাদের ছবি।

নববলমধুপানমত্ত হিতাহিতবোধহীন হিংস্রপশুপ্রায় ভয়ানক, স্ত্রীজিত, কামোন্মত্ত, আপাদমস্তক সুরাসিক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড়-সহায়, ছলে-বলেকৌশলে পরদেশ-পরধনাপহরণপরায়ণ, পরলোকে বিশ্বাসহীন, দেহাত্মবাদী, দেহপোষণৈকজীবন -- ভারতবাসীর চক্ষে পাশ্চাত্য অসুর।

এই তো গেল উভয় পক্ষের বুদ্ধিহীন বহির্দৃষ্টি লোকের কথা। ইওরোপী বিদেশী সুশীতল সুপরিষ্কৃত সৌধশোভিত নগরাংশে বাস করেন, আমাদের ‘নেটিভ’ পাড়াগুলিকে নিজেদের দেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহরের সঙ্গে তুলনা করেন। ভারতবাসীদের যা সংসর্গ তাঁদের হয়, তা কেবল একদলের লোক -- যারা সাহেবের চাকরি করে। আর দুঃখ-দারিদ্রে তো বাস্তবিক ভারতবর্ষের মতো পৃথিবীর আর কোথাও নাই! ময়লা-আবর্জনা চারিদিকে তো পড়েই রয়েছে। ইওরোপী চক্ষে এ ময়লার, এ দাসবৃত্তির, এ নীচতার মধ্যে যে কিছু ভাল থাকা সম্ভব, তা বিশ্বাস হয় না।

আমরা দেখি -- শৌচ করে না, আচমন করে না, যা-তা খায়, বাছবিচার নাই, মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচ -- এ জাতের মধ্যে কি ভাল রে বাপু!

দুই দৃষ্টিই বহির্দৃষ্টি, ভেতরের কথা বুঝতে পারে না। বিদেশীকে আমরা সমাজে মিশতে দিই না, ‘ম্লেচ্ছ’ বলি -- ওরাও ‘কালো দাস’ বলে আমাদের ঘৃণা করে।

এ দুয়ের মধ্যে কিছু সত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু দু-দলেই ভেতরের আসল জিনিস দেখেনি।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র -- ভাষা মাত্র। সেইরূপ প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে! এই ভাব জগতের কার্য করছে -- সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে-দিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সেদিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ-দারিদ্র্য, ঘরে-বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক। ইওরোপীয়দের তেমনি একটা জাতীয় ভাব আছে, জেটা না হলে সংসার চলবে না; তাই ওরা প্রবল। একেবারে নিঃশক্তি হলে কি মানুষ আর বাঁচে? জাতিটা ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র; একেবারে নির্বল নিষ্কর্মা হলে জাতটা কি বাঁচবে? হাজার বছরে নানা রকম হাঙ্গামায় জাতটা মলো না কেন? বিদেশী বিজেতাদের চেষ্টার ত্রুটি কি হয়েছে? তবু সব হিঁদু মরে লোপাট হল না কেন -- অন্যান্য অসভ্য দেশে যা হয়েছে? ভারতের ক্ষেত্র জনমানবহীন হয়ে কেন গেল না, বিদেশীরা তখুনি তো এসে চাশ-বাস করত, যেমন আমেরিকায় অস্ট্রেলিয়ায় আফ্রিকায় হয়েছে এবং হচ্ছে?

তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাবো, ওটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, মাল আছে -- এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি। এটি তোমরাও বেশ করে বোঝ -- যারা অন্তর্বহিঃ সাহেব সেজে বসেছ এবং ‘আমরা নরপশু, তোমারা হে ইওরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার কর’ বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ। আর যীশু এসে ভারতে বসেছেন বলে ‘হাঁসেন হোঁসেন’ করছ। ওহে বাপু, যীশুও আসেননি, জিহোবাও আসেননি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ষাঁড় চড়ে ভারতবর্ষ থেকে একদিকে সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলিবিস, মায় অস্ট্রেলিয়া আমেরাকার কিনারা পর্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, আর একদিকে তিব্বত, চীন, জাপান, সাইবেরিয়া পর্যন্ত বুড়ো শিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন; ঐ যে মা কালী -- উনি চীন জাপান পর্যন্ত পূজা খাচ্ছেন, ওঁকেই যীশুর-মা মেরী করে ক্রিশ্চানরা পূজা করছে। ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরই উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো শিবের প্রধান আড্ডা। ও কৈলাস দশমুন্ড-কুড়িহাত রাবণ নাড়াতে পারেননি, ও কি এখন পাদ্রী-ফাদ্রীর কর্ম! ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন -- এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন? তোমাদের দু-চারজনের জন্য দেশসুদ্ধ লোককে হাড়-জ্বালাতন হতে হবে বুঝি? চরে খাওগে না কেন?

এত বড় দুনিয়াটা পড়ে তো রয়েছে। তা নয়। মুরদ কোথায়? ঐ বুড়ো শিবের অন্ন খাবেন, আর নিমকহারামি করবেন, যীশুর জয় গাইবেন -- আ মরি!! ঐ যে সাহেবদের কাছে নাকি-কান্না ধর যে, 'আমরা অতি নীচ, আমরা অতি অপদার্থ, আনাদের সব খারাপ,' এ-কথা ঠিক হতে পারে -- তোমরা অবশ্য সত্যবাদী; তবে ঐ 'আমরা'র দেশসুদ্ধকে জড়াও কেন? ওটা কোন্‌দিশি ভদ্রতা হে বাপু?

প্রথম বুঝতে হবে যে, এমন গুণ নেই, যা কোন জাতিবিশেষের একাধিকার। তবে কোন ব্যক্তিতে যেমন, তেমনি কোন জাতিতে কোন কোন গুণের আধিক্য -- প্রাধান্য।

ধর্ম ও মোক্ষ

আমাদের দেশে 'মোক্ষলাভেচ্ছায়' প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে 'ধর্মের'। আমরা চাই কি? -- 'মুক্তি'। ওরা চায় কি? -- 'ধর্ম'। ধর্ম-কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে।

ধর্ম কি? -- যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।

মোক্ষ কি? -- যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই। এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে তো এ-লোকও নয়, পরলোকও নয়, তবে সে দাসত্ব -- লোহার শিকল আর সোনার শিকল। তারপর প্রকৃতির মধ্যে বলে বিনাশশীল সে-সুখ থাকবে না। অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীর-বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে না। এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই। এইজন্য ঐ যে কথা শুনেছ, মুক্তপুরুষ ভারতেই আছে, অন্যত্র নেই, তা ঠিক। তবে পরে অন্যত্রও হবে। সে তো আনন্দের বিষয়। এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্তমান ছিলেন। বৌদ্ধদের পর হতে ধর্মটা একেবারে অনাদৃত হল, খালি মোক্ষমার্গই প্রধান হল। তাই অগ্নিপুরাণে রূপকচ্ছলে বলেছে যে গয়াসুর (বুদ্ধ)[1] সকলকে মোক্ষমার্গ দেখিয়ে জগৎ ধ্বংস করবার উপক্রম করেছিলেন, তাই দেবতারা এসে ছল করে তাঁকে চিরদিনের মতো শান্ত করেছিলেন। ফল কথা, এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছ, ওটা ঐ ধর্মের অভাব। যদি দেশসুদ্ধ লোক মোক্ষমার্গ অনুশীলন করে, সে তো ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। নইলে খামকা দেশসুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল -- না এদিক, না ওদিক। যখন বৌদ্ধরাজ্যে এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে। বৌদ্ধ, ক্রিশ্চান, মুসলমান জৈন -- ওদের একটা ভ্রম যে সকলের জন্য সেই এক আইন, এক নিয়ম। ঐটি মস্ত ভুল; জাতি-ব্যক্তি-প্রকৃতি-ভেদে শিক্ষা-ব্যবহার-নিয়ম সমস্ত আলাদা। জোর করে এক করতে গেলে কি হবে? বৌদ্ধরা বললে, 'মোক্ষের মতো আর কি আছে, দুনিয়া-সুদ্ধ মুক্তি নেবে চল'। বলি, তা কখন হয়? 'তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ওসব কথায় বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম কর' -- এ-কথা বলেছেন হিঁদুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই। এক হাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে! কাজের কথা? দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে একবুদ্ধি হয়ে একটা সাধারণ হিতকর কাজ করতে পার

---

[1] গয়াসুর ও বুদ্ধদেবের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে স্বামিজীর মত পরে পরিবর্তিত হয়। তিনি দেহত্যাগের অল্পদিন পূর্বে কাশিধাম হইতে জনৈক শিষ্যকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে একস্থানে বলিয়াছেন : অগ্নিপুরাণে গয়াসুর সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাহাতে (যেমন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত --) বুদ্ধদেবকে লক্ষ করা হয় নাই, উহা কেবল পূর্ব হইতে প্রচলিত একটি উপাখ্যান মাত্র। ... বুদ্ধ যে গয়শীর্ষ পর্বতে বাস করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ স্থান পূর্ব হইতেই ছিল, প্রমাণিত হইতেছে। -- উদ্বোধন, ৮ম বর্ষ, ৫৮৮ পৃঃ।

না -- মোক্ষ নিতে দৌড়ুচ্ছ!! হিন্দুশাস্ত্র বলছেন যে, 'ধর্মের' চেয়ে 'মোক্ষ'টা অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐখানটায় গুলিয়ে যত উৎপাত করে ফেললে আর কি! অহিংসা ঠিক, 'নির্বৈর' বড় কথা; কথা তো বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন -- তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনমায়ান্তং'[২] ইত্যাদি। হত্যা করতে এসেছে এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নাই -- মনু বলেছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা -- বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দন্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই। এটি শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য -- স্বধর্ম কর হে বাপু! অন্যায় করো না, আথ্যাচার করো না, যতাসাধ্য পরোপকার করো। কিন্তু আণ্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে অর্থোপার্জন করে স্ত্রী-পরিবার দশজনকে প্রতিপালন -- দশটা হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে তো তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও -- আবার 'মোক্ষ'!!

পূর্বে বলেছি যে, 'ধর্ম' হচ্ছে কার্যমূলক। ধার্মিকের লক্ষণ হচ্ছে সদা কার্যশীলতা। এমন কি, অনেক-মীমাংসকের মতে বেদে যে স্থলে কার্য করতে বলছে না, সে স্থানগুলি বেদই নয় -- 'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদ্ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাং[৩]। 'ওঁকারধ্যানে সর্বার্থসিদ্ধি', 'হরিনামে সর্বপাপনাশ', 'শরণাগতের সর্বাপ্তি' -- এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্য সাধুবাক্য অবশ্য সত্য; কিন্তু দেখতে পাচ্ছ যে, লাখো লোক ওঁকার জপে মরছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত 'প্রভু যা করেন' বলছে এবং পাচ্ছে -- ঘোড়ার ডিম। তার মানে বুঝতে হবে যে, কার জপ যথার্থ হয়, কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ, কে শরণ যথার্থ নিতে পারে -- যার কর্ম করে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে আর্থাৎ যে 'ধার্মিক'।

প্রত্যেক জীব শক্তিপ্রকাশের এক-একটি কেন্দ্র। পূর্বের কর্মফলে সে শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে, আমরা তাই নিয়ে জন্মেছি। যতক্ষণ সে শক্তি কার্যরূপে প্রকাশ না হচ্ছে, ততক্ষণ কে স্থির থাকবে বল? ততক্ষণ ভোগ কে ঘোচায় বল? তবে দুঃখভোগের চেয়ে সুখভোগটা ভাল নয়? কুকর্মের চেয়ে সুকর্মটা ভাল নয়? পূজ্যপাদ শ্রীরামপ্রসাদ বলেছেন, 'ভাল মন্দ দুটো কথা, ভালটা তার করাই ভাল।'

এখন ভালটা কি? 'মুক্তিকামের ভাল' অন্যরূপ, 'ধর্মকামের ভাল' আর একপ্রকার। এই গীতাপ্রকাশক শ্রীভগবান এত করে বুঝিয়েছেন, এই মহাসত্যের উপর হিঁদুর স্বধর্ম্ম, জাতিধর্ম ইত্যাদি। 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ' -- ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য মোক্ষকামের জন্য। আর 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' ইত্যাদি, 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব' ইত্যাদি ধর্মলাভের উপায় ভগবান দেখিয়েছেন! অবশ্য, কর্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলই বা; উপোসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে ভাল-মন্দ-মিশ্র কর্ম করা ভাল নয়? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না; তবু তারা গরুই থাকে, আর দেয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়। সত্ত্বপ্রাধান্য-অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরমধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভালমন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় জড় হয়। এখন বাইরে থেকে -- এই সত্ত্বপ্রধান হয়েছে, কি তমঃপ্রধান হয়েছে, কি করে বুঝি বল? সুখদুঃখের পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব-অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি, এ কথার

---

[২] গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।। -- মনু, ৮, ৩৫০
আততায়ী ছয় প্রকার :
অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে হ্যাততায়িনঃ।। -- শুক্রনীতি

[৩] জৈমিনিসূত্র ১।২।১

জবাব দাও? -- নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। জবাব কি আর দিতে হয়? ‘ফলেন পরিচীয়তে’। সত্ত্বপ্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রয় হয়, শান্ত হয়, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রিভূত হয়ে হয়, সে শান্তি [শান্তভাব] মহাবীর্যে পিতা। সে মহাপুরুষের আর আমাদের মতো হাত পা নেড়ে কাজ করতে হয় না, তাঁর ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্ত্বগুণপ্রদান ব্রাহ্মণ, সর্বলোকপূজ্য; তাঁকে কি আর ‘পূজা কর’ বলে পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়াতে হয়? জগদম্বা তাঁর কপালফলকে নিজের হাতে লিখে দেন যে, এই মহাপুরুষকে সকলে পূজা কর, আর জগৎ অবনতমস্তকে শোনে। সেই মহাপুরুষই ‘অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ’ ইত্যাদি। আর ঐ যে মিনমিনে পিনপিনে, ঢোক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়ান্যাতা সাতদিন উপবাসীর মতো সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না -- ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ। অর্জুন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই তো ভগবান এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায়? প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ -- ‘ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ’; শেষ -- ‘তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব’। ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি -- দেশসুদ্ধ পড়ে কতই ‘হরি’ বলছি, ভগবানকে ডাকছি, ভগবান শুনছেনই না আজ হাজার বৎসর। শুনবেনই বা কেন? আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না, তা ভগবান। এখন উপায় হচ্ছে ঐ ভগবদ্বাক্য শোনা -- ‘ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ; ‘তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব’।

এখন চলুক পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের কথা। প্রথমে একটা তামাসা দেখ। ইওরোপীয়দের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, নির্বৈর হও, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজকর্ম বন্ধ কর, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আসছি, দুনিয়াটা এই দু-চার দিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর আমাদের ঠাকুর বলছেন, মহা উৎসাহে সর্বদা কার্য কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু ‘উল্টা সম্‌ঝলি রাম’ হল; ওরা -- ইওরোপীরা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সদা মহা রজোগুণ, মহাকার্যশীল, মহা উৎসাহে দেশ-দেশান্তরের ভোগসুখ আকর্ষণ করে ভোগ করছে। আর আমরা কোণে বসে, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে, দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি, ‘নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্’[4] গাচ্ছি; আর যমের ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে। আর পোড়া যমও তাই বাগ পেয়েছে, দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকছে। গীতার উপদেশ শুনলে কে? না ইওরোপী। আর যীশুখ্রীষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ করছে কে? না -- কৃষ্ণের বংশধরেরা!! এ-কথাটা বুঝতে হবে। মোক্ষমার্গ তো প্রথম বেদই উপদেশ করেছেন। তারপর বুদ্ধই বলো, আর যীশুই বলো, সব ঐখান থেকেই তো যা কিছু গ্রহণ। আচ্ছা, তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী -- ‘অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ’ -- বেশ কথা, উত্তম কথা। তবে জোর করে দুনিয়াসুদ্ধকে ঐ মোক্ষ মার্গে নিয়ে যাইয়ার চেষ্টা কেন? ঘষে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে পিরীত কি হয়? যে মানুষটা মোক্ষ চায় না, পাবার উপযুক্ত নয়, তার জন্য বুদ্ধ বা যীশু কি উপদেশ করেছেন বলো -- কিছুই নয়। ‘হয় মোক্ষ পাবে বলো, নয় তুমি উৎসন্ন যাও’ এই দুই কথা! মোক্ষ ছাড়া যে কিছু চেষ্টা করবে, সে আটঘাট তোমার বন্ধ। তুমি যে এ দুনিয়াটা একটু ভোগ করবে, তার কোনও রাস্তা নাই, বরং প্রতিপদে বাধা। কেবল বৈদিক ধর্মে এই চতুর্বর্গ সাধনের উপায় আছে -- ধর্ম, আর্থ, কাম, মোক্ষ। বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ; যীশু করলেন গ্রীস-রোমের সর্বনাশ!!! তারপর ভাগ্যফলে ইওরোপীগুলো (Protestant) হয়ে যীশুর ধর্ম ঝেড়ে ফেলে দিলে; হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ভারতবর্ষে কুমারিল্ল ফের কর্মমার্গ চালালেন, শঙ্কর আর রামানুজ চতুর্বর্গের সমন্বয়স্বরূপ সনাতন বৈদিক মত ফের প্রবর্তন করলেন, দেশটার বাঁচবার আবার উপায় হল। তবে ভারতবর্ষে ত্রিশ ক্রোর লোক, দেরি হচ্ছে। ত্রিশ ক্রোর লোককে চেতানো কি একদিনে হয়?

বৌদ্ধধর্মের আর বৈদিক ধর্মের উদ্দেশ্য এক। তবে বৌদ্ধমতের উপায়টি ঠিক নয়। উপায় যদি ঠিক হত তো আমাদের এ সর্বনাশ কেন হল? ‘কালেতে হয়’ বললে কি চলে? কাল কি কার্যকারণসম্বন্ধ ছেড়ে কাজ করতে পারে?

---

[4] শঙ্করাচার্য-কৃত ‘মোহমুদ্গর’, ৫

স্বধর্ম বা জাতিধর্ম

অতএব উদ্দেশ্য এক হলেও উপায়হীনতায় বৌদ্ধরা ভারতবর্ষকে পতিত করেছে। বৌদ্ধবন্ধুরা চটে যাও, যাবে; ঘরের ভাত বেশী করে খাবে। সত্যটা বলা উচিত। উপায় হচ্ছে বৈদিক উপায় -- 'জাতিধর্ম' 'স্বধর্ম' যেটি বৈদিক ধর্মের -- বৈদিক সমাজের ভিত্তি। আবার অনেক বন্ধোকে চটালুম, অনেক বন্ধু বলছেন যে, এ দেশের লোকের খোশামুদি হচ্ছে। একটা কথা তাঁদের জন্যে বলে রাখা যে, দেশের লোকের খোশামোদ করে আমার লাভটা কি? না খেতে পেয়ে মরে গেলে দেশের লোকে একমুঠা অন্ন দেয় না; ভিক্ষে-শিক্ষে করে বাইরে থেকে এনে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অনাথকে যদি খাওয়াই তো তার ভাগ নেবার জন্য দেশের লোকের বিশেষ চেষ্টা; যদি না পায় তো গালাগালির চোটে অস্থির!! হে স্বদেশীয় পন্ডিতমন্ডলী! এই আমাদের দেশের লোক, তাদের আবার কি খোশামোদ? তবে তারা উন্মাদ হয়েছে, উন্মাদকে যে ঔষধ খাওয়াতে যাবে, তার হাতে দু-দশটা কামড় অবশ্যই উন্মাদ দেবে; তা সয়ে যে ঔষধ খাওয়াতে যায়, সে-ই যথার্থ বন্ধু।

এই 'জাতিধর্ম' 'স্বধর্ম'ই সকল দেশে সামাজিক কল্যাণের উপায় -- মুক্তির সোপান। ঐ 'জাতিধর্ম' 'স্বধর্ম' নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশটার অধঃপতন হয়েছে। তবে নিধুরাম সিধুরাম যা জাতিধর্ম স্বধর্ম বলে বুঝেছেন, ওটা উল্টো উৎপাত; নিধু জাতিধর্মের ঘোড়ার ডিম বুঝেছেন, ওঁর গাঁয়ের আচারকেই সনাতন আচার বলে ধারণা করছেন, নিজের কোলে ঝোল টানছেন, আর উৎসন্ন যাচ্ছেন।

আমি গুণগত জাতির কথা বলছি না, বংশগত জাতির কথা বলছি, জন্মগত জাতির কথা বলছি। গুণগত জাতিই আদি, স্বীকার করি; কিন্তু গুণ দু-চার পুরুষে বংশগত হয়ে দাঁড়ায়। সেই আসল জায়গায় ঘা পড়েছে, নইলে সর্বনাশ হল কেন? 'সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।'[৫] কেমন করে এ ঘোর বর্ণসাঙ্কর্য উপস্থিত হল -- সাদা রঙ কাল কেন হল, সত্ত্বগুণ রজোগুণপ্রধান তমোগুণে কেন উপস্থিত হল -- সে সব অনেক কথা, বারান্তরে বলবার রইল। আপাততঃ এইটি বোঝ যে, জাতিধর্ম যদি ঠিক ঠিক থাকে তো দেশের অধঃপতন হবেই না। এ-কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের অধঃপতন কেন হল? অবশ্যই জাতিধর্ম উৎসন্নে গেছে। অতএব যাকে তোমরা জাতিধর্ম বলছ, সেটা ঠিক উল্টো। প্রথম পুরাণ পুঁথি-পাটা বেশ করে পড়গে, এখনি দেখতে পাবে যে, শাস্ত্র যাকে জাতিধর্ম বলছে, তা সর্বত্রই প্রায় লোপ পেয়েছে। তারপর কিসে সেইটি ফের আসে, তারই চেষ্টা কর; তাহলেই পরম কল্যাণ নিশ্চিত। আমি যা শিখেছি, যা বুঝেছি, তাই তোমাদের বলছি; আমি তো আর বিদেশ থেকে তোমাদের হিতের জন্য আমদানি হইনি যে, তোমাদের আহাম্মকিগুলিকে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হবে? বিদেশী বন্ধুর কি? বাহবা লাভ হলেই হল। তোমাদের মুখে চুণকালি পড়লে যে আমার মুখে পড়ে, তার কি?

পূর্বেই বলেছি যে, প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতিনীতি সেই উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী হয়ে গড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতির জীবন ঐ উদ্দেশ্যটি এবং তদুপযোগী উপায়রূপ আচার ছাড়া, আর সমস্ত রীতিনীতিই বাড়ার ভাগ। এই বাড়ার ভাগ রীতিনীতিগুলির হ্রাস-বৃদ্ধিতে বড় বেশি এসে যায় না; কিন্তু যদি সেই আসল উদ্দেশ্যটিতে ঘা পড়ে, তখুনি সে জাতির নাশ হয়ে যাবে।

ছেলেবেলায় গল্প শুনেছ যে রাক্ষসীর প্রাণ একটা পাখির মধ্যে ছিল। সে পাখিটার নাশ না হলে রাক্ষসীর কিছুতেই নাশ হয় না; এও তাই। আবার দেখবে যে, যে অধিকারগুলো জাতীয় জীবনের জন্য একান্ত আবশ্যক নয়,

---

[৫] গীতা, ৩।২৪

সে অধিকারগুলো সব যাক না সে জাতি বড় তাতে আপত্তি করে না, কিন্তু যখন যথার্থ জাতীয় জীবনে ঘা পড়ে, তৎক্ষণাৎ মহাবলে প্রতিঘাত করে।

তিনটি বর্তমান জাতির তুলনা কর, যাদের ইতিহাস তোমরা অল্পবিস্তর জানো -- ফরাসী, ইংরেজ, হিন্দু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদন্ড। প্রজারা সব অত্যাচার অবাধে সয়, করভারে পিষে দাও, কথা নেই; দেশসুদ্ধকে টেনে নিয়ে জোর করে সেপাই কর, আপত্তি নেই; কিন্তু যেই সে স্বাধিনতার উপর হাত কেউ দিয়েছে, অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ প্রতিঘাত করবে। কেয় কারুর উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পাবে না, এইটিই ফরাসীচরিত্রের মূলমন্ত্র। ‘জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ বংশ, নীচ বংশ, রাজ্য-শাসনে সামাজিক স্বাধিনতায় আমাদের সমান অধিকার।’ -- এর উপর হাত কেউ দিতে গেলেই তাঁকে ভুগতে হয়।

ইংরেজ-চরিত্রে ব্যবসাবুদ্ধি, আদান প্রদান প্রধান; যথাভাগ ন্যায়বিভাগ -- ইংরেজের আসল কথা। রাজা, কুলীনজাতি-অধিকার, ইংরেজ ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করে; কেবল যদি গাঁট থেকে পয়সাটি বার করতে হয় তো তার হিসাব চাইবে। রাজা আছে, বেশ কথা -- মান্য করি, কিন্তু টাকাটি যদি তুমি চাও তো তার কার্য-কারণ, হিসাবপত্রে আমি দু-কথা বলব, বুঝব, তবে দেব। রাজা জোর করে টাকা আদায় করতে গিয়ে মহাবিপ্লব উপস্থিত করালেন; রাজাকে মেরে ফেললে।

হিন্দু বলছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা -- বেশ কথা কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা -- ‘মুক্তি’। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য; বৈদিক বল, জৈন বল, বৌদ্ধ বল, অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত যা কিছু বলো, সব ঐখানে আক মত। ঐখানটায় হাত দিও না, তাহলেই সর্বনাশ; তা ছাড়া যা কর, চুপ করে আছি। লাথি মারো, ‘কালো’ বলো, সর্বস্ব কেড়ে লও -- বড় এসে যাচ্ছে না; কিন্তু ঐ দোরটা ছেড়ে রাখ। এই দেখ, বর্তমান কালে পাঠান বংশরা আসছিল যাচ্ছিল, কেউ সুস্থির হয়ে রাজ্য করতে পারছিল না; কেন না, ঐ হিঁদুর ধর্মে ক্রমাগত আঘাত করছিল। আর মোগল রাজা কেমন সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠ,কেমন মহাবল হল। কেন? না -- মোগলরা ঐ জায়গাটায় ঘা দেয়নি। হিঁদুরাই তো মোগলের সিংহাসনের ভিত্তি, জাহাঙ্গীর, শাজাহান, দারাসেকো -- এদের সকলের মা যে হিঁদু। আর দেখ, যেই পোড়া আরঙ্গজেব আবার ঐখানটায় ঘা দিলে, আমনি এত বড় মোগল রাজ্য স্বপ্নের ন্যায় উড়ে গেল। ঐ যে ইংরেজের সুদৃঢ় সিংহাসন, এ কিসের উপর? ঐ ধর্মে হাত কিছুতেই দেয় না বলে। পাদরী-পুঙ্গবেরা একটু আধটু চেষ্টা করেই তো ’৫৭ সালের হাঙ্গামা উপস্থিত করেছিল। ইংরেজরা যতক্ষণ এইটি বেশ করে বুঝবে এবং পালন করবে, ততক্ষণ ওদের ‘তকত তাজ অচল রাজধানী’। বিজ্ঞ বহুদর্শী ইংরেজরাও এ-কথা বোঝে, লর্ড রবার্টসের ‘ভারতবর্ষে ৪১ বৎসর’[৬] নামক পুস্তক পড়ে দেখ।

এখন বুঝতে পারছ তো, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখিটি কোথায়? -- ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে। আচ্ছা, একজন দেশী পন্ডিত বলছেন যে ওখানটায় প্রাণটা রাখবার এত আবশ্যক কি? সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতায় রাখ না কেন? -- যেমন অন্যান্য অনেক দেশে। কথাটি তো হল সোজা; যদি তর্কচ্ছলে স্বীকার করা যায় যে, ধর্ম কর্ম সব মিথ্যা, তাহলেও কি দাঁড়ায়, দেখ। অগ্নি তো এক, প্রকার বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজ বাণিজ্য সুবিচার-বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে বিকাশ হয়েছে। কিন্তু এই মহাশক্তির প্রেরণায় শতাব্দী-কতক নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে ফরাসী বা ইংরেজ চরিত্র গড়ে গেছে এবং তারই প্রেরণায় লক্ষ শতাব্দীর আবর্তনে হিঁদুর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ। বলি, আমাদের লাখো বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা, না তোমার বিদেশীর দু-পাঁচশ বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা? ইংরেজ কেন ধর্মপ্রাণ হোক না, মারামারি কাটাকাটিগুলো ভুলে শান্ত শিষ্টটি হয়ে বসুক না?

---

[৬] *Forty-one Years in India*, Lord Roberts -- Chapters 30 & 31

আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১,০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্ত করে তো ইদিক উদিক ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এইমাত্র। সে নদী যেমন করে হোক সমুদ্রে যাবেই দু-দিন আগে বা পরে, দুটো ভাল জায়গার মধ্য দিয়ে, না হয় দু-একবার আঁস্তাকুড় ভেদ করে। যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো আর একন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই তো নয়।

কিন্তু এ বুদ্ধিটি আগাপাস্তলা ভুল, মাপ করো, অল্পদর্শীর কথা। দেশে দেশে আগে যাও এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ করে দেখ, নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়, তারপর যদি মাথা থাকে তো ঘামাও, তার উপরে নিজেদের পুরাণ পুথি-পাটা পড়, ভারতবর্ষের দেশ-দেশান্তর বেশ করে দেখ, বুদ্ধিমান পন্ডিতদের চোখে দেখ, খাজা আহাম্মকের চোখে নয়, সব দেখতে পাবে যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধকধক করছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র! আর দেখবে যে, এ দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম; আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র!

তা ছাড়া উপায় তো সব দেশেই সেই এক, অর্থাৎ গোটাকতক শক্তিমান্ পুরুষ যা করছে, তাই হচ্ছে; বাকিগুলো খালি 'ভেড়িয়া-ধসান'[৭] বই তো নয়। ও তোমার 'পার্লেমেন্ট' দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান্ পুরুষেরা যে দিকে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল। তবে ভারতবর্ষে, শক্তিমান্ পুরুষ কে? না -- ধর্মবীর। তাঁরা আমাদের সমাজকে চালান। তাঁরাই সমাজের রীতিনীতি বদলাবার দরকার হলে বদলে দেন। আমরা চুপ করে শুনি আর করি। তবে এতে তোমার বাড়ার ভাগ ঐ মেজরিটি ভোট প্রভৃতি হাঙ্গামগুলো নেই, এই মাত্র।

অবশ্য ভোট-ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের যে একা শিক্ষা হয়, সেটা আমরা পাই না, কিন্তু রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইওরোপীয় দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নেই। সে ঘুষের ধুম, সে দিনে ডাকাতি, যা পাশ্চাত্যদেশে হয় রামচন্দ্র! যদি ভেতরের কথা দেখতে তো মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে। 'গো-রস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠি বিকায়। সতীকো না মিলে ধোতি, কস্‌বিন্ পহনে খাসা।।'[৮] যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে, জিত হলে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো তো সেইখানেই মারা গেল; হে রাম! চমকে যেও না, ভাঁওতায় ভুলো না।

একটা কথা বুঝে দেখ। মানুষে আইন করে, না আইনে মানুষ করে? মানুষে টাকা উপায় করে, না টাকা মানুষ করতে পারে? মানুষে নাম-যশ করে, না নাম-যশে মানুষ করে?

মানুষ হও রামচন্দ্র! অমনি দেখবে ও-সব বাকি আপনা-আপনি গড়গড়িয়ে আসছে। ও পরস্পরের নেড়িকুত্তোর খেয়োখেয়ী ছেড়ে সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস, সদ্বীর্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ তো একটা দাগ

---

[৭] 'গড্ডলিকা-প্রবাহ' -- যেমন একটি মেষের অনুকরণে অপর মেষসমূহ তদনুরূপ কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয়।

[৮] দুগ্ধ গলিতে গলিতে ফেরি করিতে হয়, কিন্তু সুরা এক স্থানে বসিয়াই বিক্রয় হয়। সতী নারীর পরিধানে বস্ত্র জুটে না, অসতী সুবেশ পরিধান করে। -- তুলসীদাস

রেখে যাও। ‘তুলসী যব জগমে আয়ো জগ হসে তুম রোয়। এয়সী করনী কর্ চলো কি তুম্ হসে জগ রোয়।।’[৯] -- যখন তুমি জন্মেছিলে, তুলসী, সকলে হাসতে লাগলো, তুমি কাঁদতে লাগলে; এখন এমন কাজ করে চল যে, তুমি হাসতে হাসতে মরবে, আর জগৎ তোমার জন্য কাঁদবে। এ পারো তবে তুমি মানুষ, নইলে কিসের তুমি?

আর এক কথা বোঝ দাদা, অবশ্য আমাদের অন্যান্য জাতের কাছে অনেক শেখবার আছে। যে মানুষটা বলে আমার শেখার নেই, সে মরতে বসেছে; যে জাতটে, বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট। ‘যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।’ তবে দেখ, জিনিসটা আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে এইমাত্র। আর আসলটা সর্বদা বাঁচিয়ে বাকি জিনিস শিখতে হবে। বলি -- খাওয়া তো সব দেশেই এক; তবে আমরা পা গুটিয়ে বসে খাই, বিলাতিরা পা ঝুলিয়ে বসে খায়। আখন মনে কর যে, আমি এদের রকমে রান্না খাওয়া খাচ্ছি; তা বলে কি এদের মতো ঠ্যাঙ ঝুলিয়ে থাকতে হবে? আমার ঠ্যাঙ যে যমের বাড়ি যাবার দাখিলে পড়ে -- টনটনানিতে যে প্রাণ যায়, তার কি? কাজেই পা গুটিয়ে, এদের খাওয়া খাব বইকি। ঐ রকম বিদেশী যা কিছু শিখতে হবে, সেটা আমাদের মতো করে -- পা গুটিয়ে আসল জাতীয় চরিত্রটি বজায় রেখে। বলি, কাপড়ে মানুষ হয়, না মানুষে কাপড় পরে? শক্তিমান্ পুরুষ যে পোশাকই পরুক না কেন, লোকে মানে; আর আমার মতো আহাম্মক ধোপার বস্তা ঘাড়ে করে বেড়ালেও লোকে গ্রাহ্য করে না।

---

[৯] তুলসীদাসের দোঁহা